ইসলাম জীবনের ধর্ম

শরীফ মুহাম্মদ

ইসলাম জীবনের ধর্ম

শরীফ মুহাম্মদ
নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আল কাউসার
বিভাগীয় সম্পাদক, দৈনিক আমার দেশ

প্রকাশনায়
রাহনুমা প্রকাশনী ™

ইসলাম জীবনের ধর্ম

গ্রন্থনা	শরীফ মুহাম্মদ
প্রথম প্রকাশ	অক্টোবর ২০১৬
প্রচ্ছদ	মুহাম্মাদ মাহমুদুল ইসলাম
মুদ্রণ	ফারিয়া প্রিন্টিং প্রেস ৩/১, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০
একমাত্র পরিবেশক	**রাহনুমা প্রকাশনী** ইসলামী টাওয়ার, ৩২/এ আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা। যোগাযোগ : ০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯, ০১৯৭২-৫৯৩৩৪৯

মূল্য : ৩০০.০০ (তিনশো টাকা মাত্র)

ISLAM JIBONER DHORMO
Written by: Sharif Muhammad
Market & Published by: Rahnuma Prokashoni. Price: Tk. 000.00, US $ 8.00 only.

ISBN 978-984-92212-0-3
E-mail: rahnumaprokashoni@gmail.com
web : www.rahnuma.com

জীবনের জন্য

বিশটি ছোট-বড় প্রবন্ধ। জীবনের বিভিন্ন অনুসঙ্গ এ সব প্রবন্ধের বিষয়। কখনো বোধ কখনো সমাজ। চেতনা ও আচরণের কিছু দর্পণ এ সবের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে। ভাষা গল্পসল্প ও আলাপচারিতার সামান্য সম্পাদনার প্রলেপসহ এই পরিবেশনা।

অর্পণ

হযরত মাওলানা আব্দুল হাই পাহাড়পুরীকে
ইসলামের পথ ও সাধনায়
তিলে তিলে জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন।
আল্লাহ তাআলা তাঁকে জান্নাতের
উঁচু মাকাম দান করুন।

ভূমিকা

সূচিপত্র

জীবনের জন্য

ভাষায়-শব্দে স্বাতন্ত্র্য
পয়লা বৈশাখ : এখন যেমন
প্রসঙ্গ মোহর : উদাসীনতা ও কিছু কথা
যৌতুক : কনের অশ্রু, বরের উল্লাস
চিরন্তন দশ অসিয়ত
আধুনিক শিক্ষিত দ্বীনদার : ত্যাগ সারল্য ও বিড়ম্বনা
দুর্নীতি : জাহেলিয়াতের নতুন অন্ধকার
সরকারের ক্ষুদ্র ঋণদান কার্যক্রম শরীয়াভিত্তিক হতে পারে
এ দেশে সংস্কৃতি : বিকৃতি ও বিভ্রান্তি
মাতৃজাতির সম্ভ্রম বেচাকেনা বন্ধ করুন
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত : পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য
মুসলমান : পারস্পরিক দায়িত্বের বন্ধন
সুন্নতের গুরুত্ব : অনুসরণ-অবহেলার কিছু কথা
মৃত্যুর দুই পাশে
ছোটদের প্রতি স্নেহ দ্বীন ও বিবেকের দাবি
বিপদ-আপদ-মুসীবতে অনুযোগ নয়, প্রত্যাবর্তন ও অনুতাপই শেষ কথা
অহেতুক ও অবান্তর প্রশ্ন ত্যাগ করাই সদ্‌গুণ
মাহে রমযান : পারস্পরিক সহযোগিতা বিবেচনা দায়িত্ব ও ছাড়ের কিছু কথা
ফেতরার উচ্চ হারগুলোর ধারণা প্রতিষ্ঠিত হলে উপকৃত হবে সমাজের অভাবী মানুষ
সেক্যুলার ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের গল্প

মনীষীর মুখোমুখি

রমযানে বেশি কুরআন তিলাওয়াত করুন
–শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক (রহ.)
গরিব মানুষদের ঈদের আনন্দে শরিক করুন
–মুফতী ফজলুল হক আমিনী
কুলির মজুরিও আমার পকেটে ছিল না
–মাওলানা মুহিউদ্দীন খান
কিছু তরুণ আলেম-লেখকের লেখার মান আশাব্যঞ্জক

–মাওলানা মুহিউদ্দীন খান
হজ্ব : রওযার ছবি তো দিলে ধারণ করবে, ক্যামেরায় নয়
–মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক
শুধু আরবদের নয়, হিজরি মুসলমানদের সন
–মুফতী আবুল হাসান মুহাম্মদ আবদুল্লাহ
বনু কুরাইজাকে পাকড়াও করা হয়েছিল বিশ্বাসঘাতকতার কারণে
–মুফতী আবুল হাসান মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ
হাজারখানেক ইতিহাসভিত্তিক উপন্যাস বাংলায়
–আবদুল মান্নান তালিব
ইসলামে শ্রমের মর্যাদা, অধিকার ও দায়িত্ব
–মাওলানা আবদুল জাব্বার, ড. আবদুল মাবুদ ও ড. আ ফ ম আবদুল জলীল
রমজানের শৃঙ্খলাবোধই মানুষকে বুঝতে শেখায় যে সে মানুষ
–বিচারপতি মোহাম্মদ আব্দুর রউফ
দাওয়াতের অন্য নাম ভালোবাসা
–শাহ আবদুল হান্নান
অজানাকে জানা ইসলামের শিক্ষা
–ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান
ইমাম গাযালী দর্শনশাস্ত্রে সংস্কারকের ভূমিকা পালন করেছেন
–প্রফেসর ড. এম আবুল কাসেম
কওমী মাদরাসাই আমাদের জীবন ও শিক্ষার ভিত্তি
ড. এবিএম হিযবুল্লাহ
অধ্যাপক ড. আ.ফ.ম. খালিদ হোসেন
ড. মুশতাক আহমদ
ড. আবদুল জলীল
প্রফেসর মুহাম্মদ তারেক
ডা. আবদুল বারী

আবেগের ফুলকি

আমাদের আদর্শের ঠিকানা
এই সব হাত গুঁড়িয়ে দাও
ফতোয়া : বিষোদগার চলবে আর কতদিন ?
বৃহৎ ইসলামী বিশ্বকোষ, বাংলা প্রকাশনার আলোকিত মাইলস্টোন
জার্মান পণ্ডিত হ্যান্সের বিকৃত ইসলাম চর্চা এবং কিঞ্চিৎ আলোকপাত

بسم الله الرحمن الرحيم

ভাষায়-শব্দে স্বাতন্ত্র্য

ভাষা তো হচ্ছে ভাব ব্যক্ত করার মাধ্যম। এটি সরাসরি আল্লাহ তাআলার দান। আল্লাহ শিখিয়েছেন মানুষকে। আল্লাহ নিজেই ঘোষণা করেছেন : (তরজমা) তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষ, তাকে শিখিয়েছেন ভাষা। (সূরা আর রাহমান ৫৫ : ৩-৪) সেজন্যই ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যসহ দুনিয়ার সব ভাষাকে আল্লাহর দান হিসেবে গ্রহণ করা সঙ্গত ও বাঞ্ছনীয়। এবং এ কারণে অনুভূতি, কথা ও আচরণে আল্লাহর প্রতি বান্দার কৃতজ্ঞতার বিষয়টিও প্রয়োজনীয়, সঙ্গত ও প্রাসঙ্গিক। অন্তত বিশ্বাসী ও মুমিন বান্দাদের ক্ষেত্রে এর প্রাসঙ্গিকতা প্রশ্নাতীত।

ভাষা বা ভাব ব্যক্ত করার সাধারণ কৃতজ্ঞতার ধরনটি পরিষ্কার। উচ্চারণ-আবৃত্তিতে মহান রাব্বুল আলামীনের হামদ-সানা পাঠ করা, গুণগান গাওয়া। আল্লাহ তাআলার নাফরমানি হয়, এমন কথা বর্জন করা। তবে, এর সবচেয়ে প্রয়োগ-বহুল ধরনটিই অনেক সময় ধারণায় বিরাজ করে অপরিষ্কার বা অস্পষ্টরূপে। সেটি হলো শব্দ-ভাষার সাধারণ প্রয়োগে আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশক অবস্থান বা পরিস্থিতি বজায় রাখা। আল্লাহর একত্ববাদ পরিপন্থি কিংবা ইসলামী স্বাতন্ত্র্য বিনাশকারী শব্দ-ভাষা পরিহার করা। স্বতন্ত্র ইসলামী জাতিসত্তা ও চিন্তাচেতনা রহিতকারী শব্দ পরিভাষা এড়িয়ে চলা। অথচ বাস্তবে শব্দ প্রয়োগ ও ভাষার সাধারণ উপস্থাপনায় এই সতর্কতা রক্ষার কাজটি কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পালিত হয় না। আর এ ধরনের পরিস্থিতি বেশি ঘটে থাকে অনারব ভাষা-শব্দাবলির ক্ষেত্রে। আমরা বাংলাভাষার ক্ষেত্রেও এ সমস্যাটা অহরহ ঘটতে দেখি। সে সম্পর্কেই এখানে সামান্য কথকতা।

দুই.

বাংলাভাষার শব্দাবলির একটা উৎস সংস্কৃত ভাষা। সংস্কৃত-আশ্রয়ী বাংলাভাষার প্রভাবশালী ব্যবহারকারী হচ্ছে এ অঞ্চলের হিন্দু সম্প্রদায়। এ জন্য বাংলায় ব্যবহৃত বহু সাধারণ শব্দে হিন্দুধর্মীয় বোধ ও প্রতীকের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। সে অর্থে প্রচুর শব্দ আপাত চোখে নিরীহ মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তীব্র শিরকি মর্মের বাহক। যেমন : ব্রহ্মাণ্ড, রাহু, সূর্যসন্তান, লক্ষ্মী, অগ্নিপুত্র ইত্যাদি। অপর দিকে এমন কিছু শব্দও রয়েছে যেগুলোর শাব্দিক অর্থে মন্দত্ব নেই, কিন্তু প্রয়োগ ক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্যের কারণে শব্দটি ইসলামী বোধ-বিশ্বাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন হিসেবে প্রতিভাত হয়। বলা যায় অর্থের বৃত্তে শব্দের অস্তিত্ব নির্দোষ হলেও প্রয়োগের পরিবেশে সেটি অপাংক্তেয়। এর মূল কারণ প্রয়োগের পরিবেশ, পূর্বাপর অবস্থা, সমাজ ও মানুষের সাধারণ রেওয়াজ এবং পরিস্থিতির উপাদান। যেমন এ বছর দেশের বৃহত্তর ডায়েরী ও ক্যালেন্ডার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানটির একটি ক্যালেন্ডার করা হয়েছে বিভিন্ন দেশের মসজিদের ছবি এবং ছবির বর্ণনা দিয়ে। এরকমই একটি ছবির বর্ণনায় বলা হলো, সেখানে এত সংখ্যক লোক একসঙ্গে 'প্রার্থনা' করতে পারে। মসজিদের ভিতরে যে ইবাদতটি করা হয় সেটির নাম সালাত বা নামায। বাংলাদেশে এই ভাষাতেই শব্দটিকে চিহ্নিত করা হয়। এর বাইরে গিয়ে এই সমাজে ওই ইবাদতটিকে 'প্রার্থনা' হিসেবে প্রয়োগ করা আসলে সামঞ্জস্যহীন কিংবা অপ্রাসঙ্গিক। সিয়াম বা রোযাকে যদি কেউ স্বাভাবিক বর্ণনায় লেখে 'উপবাস-পালন' তাহলেও একই সমস্যা হয়। অবশ্য যে সমাজে ব্যাপকভাবে ইসলামের ইবাদতগুলোর পরিচয় অস্পষ্ট সেখানে প্রাথমিক পরিচিতি তুলে ধরার জন্য এ জাতীয় শব্দের প্রয়োগ চলতে পারে। সাধারণ পর্যায়ে সাধারণ পরিস্থিতিতে ইসলামী পরিচিতিমূলক শব্দের পরিবর্তে এ জাতীয় শব্দের ব্যবহার সঙ্গত ও শোভন হতে পারে না।

একইভাবে মুসলিম জীবনাচারের সঙ্গে জড়িত প্রাচীন ও সুপরিচিত শব্দগুলোর হঠাৎ বাংলাকরণ নিয়েও অভিন্ন সমস্যা তৈরি হচ্ছে। লাশকে ইদানীং বলা হচ্ছে, মরদেহ। দাফন-কাফনকে বলা হচ্ছে সৎকার এবং কাফফারাকে বলা হচ্ছে প্রায়শ্চিত্ত। এ জাতীয় বহু শব্দ হঠাৎ 'বাংলা-

প্রবণতা'-রোগে আক্রান্ত হয়ে স্বকীয়তা হারাচ্ছে। মরদেহ-সৎকার বা শেষকৃত্য এবং 'প্রায়শ্চিত্ত'টা কার দিতে হচ্ছে? সে কি মুসলিম না কি অমুসলিম? এটা চিহ্নিত করাও মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। এটা ভাষায়-শব্দে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যের বিষয়টিকে পুরোপুরি বিলুপ্ত করার একটা ধীর ও লঘু পদক্ষেপ কি না অনেকে তেমন সন্দেহ করছেন। কারণ অন্য কোথাও সেভাবে না চললেও ইদানীং বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলো আর এফএম রেডিওগুলো এ জাতীয় শব্দ ও বাক্যের ব্যবহারে যেন উঠে পড়ে লেগেছে।

তিন.

মুসলিম সমাজে নির্দোষ সংস্কৃত বা বাংলা শব্দের আরেকটা অসঙ্গত ব্যবহারের বাড়তি প্রবণতা শুরু হয়েছে গত দেড় দশক ধরে। এর আগেও এ প্রবণতা ছিল। তবে সেটা ছিল অত্যন্ত অনুল্লেখ্য ও সীমিত পরিসরে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এক্ষেত্রে যেন উঠেপড়ে লাগার মতো অতি বাঙ্গালিয়ানার একটা মহড়া শুরু হয়েছে। সেটা হচ্ছে, বাংলা বা বাংলায় ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দে মুসলিম নাম রাখা। অত্যন্ত শ্রুতিকটু এসব 'বাংলা-সংস্কৃত' নামের কারণে এখন মুসলিম পরিচিতি নিয়েও সমস্যা তৈরি হওয়ার ঘটনা ঘটছে। ভাষার স্বাভাবিক ধারায় ওইসব শব্দের প্রয়োগ নিয়ে প্রশ্নের কোনো অবকাশ হয়তো নেই। কিন্তু কোনো মুসলিমের নামে এমন শব্দের প্রয়োগ যথেষ্ট প্রশ্ন ও জটিলতার সৃষ্টি করে চলেছে। কিছু নামের শব্দ এখানে উল্লেখ করা যাক : স্নেহা, ঐশ্বর্য, পরম, শুভ্র, আশীষ, বর্ষণ, মেঘ, শতাব্দী, শরৎ, শিমুল, সমর। একটু চোখ মেলে দেখলেই অনুভব করা যাবে এ জাতীয় শব্দে এখন বহু মুসলিম শিশু এবং কিশোর-কিশোরীর নাম রয়েছে আমাদের সমাজে। অবশ্য পঞ্চাশ বছর আগেও এ জাতীয় কিছু কিছু শব্দ নাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন : শিমুল, সজল, রতন, বাদল। তবে প্রবণতার মাত্রাটা ছিল কম। আর শব্দগুলো অত বেশি হিন্দুসমাজে ব্যবহৃত নাম-শব্দের কাছাকাছি তখন ছিল না। কিন্তু বর্তমানে বহু কিশোর-কিশোরীর নাম শুনে প্রথমে ধর্মীয় পরিচিতি নির্ধারণের প্রশ্নে থমকে থাকতে হয়। বুঝতে একটু দেরি হয়, সে মুসলিম না কি অমুসলিম? এরপর আরো কিছু কথা, আরো কিছু আচরণে সেটা ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়। এছাড়াও অর্ধেক বাংলা অর্ধেক আরবী শ্রুতিকটু ও মিশ্রভাষার এক ধরনের মুসলিম নামেরও

প্রচলন শুরু হয়েছে। যেমন আশীষ-উর-রহমান, প্রভাষ আমীন, সুমন রহমান, সকাল আহমদ, সমর হোসেন। এসব নামেও পরিচিতি সংকটের পাশাপাশি হীনম্মন্যতার নতুন দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হয়। এসব নামের মধ্য দিয়ে আচরণ ও ভাবে এটাই প্রকাশ হয় যে, নামের জন্য ইসলামী ও আরবী শব্দ যথেষ্ট হয়নি। বাধ্য হয়েই বাংলা কিংবা সংস্কৃত শব্দের কাছে ধরনা দিতে হয়েছে। এটাও সমীচীন হতে পারে না। নামে-শব্দে মুসলিম পরিচয়ের এই ইচ্ছাকৃত সংকট তৈরি কি খুব শোভন কিছু? খুব লাভজনক কিছু? মনে হয় না।

মুসলমানের ওপর মুসলিম নিধনকামী আগ্রাসী শক্তির হামলা নেমে এলে নামের অস্পষ্টতা দিয়ে বাঁচা যায় না। বসনিয়া চেচনিয়ায় বাঁচা যায়নি। অপরপক্ষে দ্বীনী পরিচয়ে কোনো রহমত আসতে চাইলে এ অস্পষ্ট পরিচয়ের কারণে বাধাগ্রস্ত হয়। যেমন, ওই নামের কারণে অপরিচিত মানুষ সালাম দিতে দ্বিধায় পড়ে যায়। এটি একটি সরল ও সাধারণ হিসাব। নামের শব্দসংকট থেকে উদ্ভূত আত্মপরিচিতি সংকট মুসলমানকে ধর্মীয় ও জাগতিক নানা রকম সমস্যায় ফেলতে পারে।

চার.

সমস্যার সবটুকু অতি বাংলায়ন প্রবণতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; এর একটা দিক ইংরেজির দিকেও গেছে। মুসলিম নামের বাংলায়ন ঘটার পেছনে সাধারণত যে মানসিকতা কাজ করেছে সেটা হচ্ছে প্রতিবেশ থেকে প্রভাবগ্রহণ, প্রচার ও প্রতিষ্ঠার অনুকরণ এবং আত্মপরিচিতিমূলক ঐতিহ্যবাদী আরবী-ফার্সী উর্দু শব্দ ব্যবহারে হীনম্মন্যতা। সে কারণে যেভাবে কিছু প্রবণতা বাংলা নামের দিকে গেছে, একইভাবে গেছে ইংরেজিসহ পশ্চিমা কোনো কোনো ভাষার শব্দের দিকেও। সেজন্যই জর্জ, লিংকন ইত্যাদি নাম-শব্দের কিছু ব্যবহারও বাংলাদেশী মুসলমানদের মাঝে দেখা যায়। এক্ষেত্রে যে বিষয়টা বেশি ঘটে সেটা হচ্ছে, পশ্চিমা সমাজে ব্যবহৃত এমন কিছু বাক্যের ব্যবহার, যা মুসলিম বোধ-বিশ্বাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল নয়। যেমন : কোনো আক্ষেপ ও বিস্ময়সূচক ক্ষেত্রে বলা হয় : ও মাই গড!

সুবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ, ইন্না লিল্লাহ-এর পরিবর্তে 'ও মাই গড' বলায় কেবল ইংরেজি ভাষার প্রয়োগ হয়, এতটুকুই নয়। বরং এ বাক্যে ব্যবহৃত 'গড' শব্দ সব অর্থে ইসলামী বিশ্বাসের 'আল্লাহ' কিংবা 'রহমান'-এর প্রতিশব্দ নয়।

দ্বিতীয়ত নাম-শব্দে হোক কিংবা সাধারণ ভাষার ব্যবহারে হোক স্বকীয়তা এবং স্বাতন্ত্র্য ধরে রাখা মুসলমানের জন্য অবশ্য-করণীয়। অপর কোনো জাতি বা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অনুকরণ—সেটা পোশাকে, আচারে, ভাষায় যেক্ষেত্রেই হোক—মুসলামানের জন্য শোভন নয়। আঞ্চলিক জাতীয়তা, আঞ্চলিক ভাষা কিংবা ভূখণ্ডগত অর্থে মাতৃভাষার দোহাই দিয়ে যেমন আমাদের ইবাদতের ভাষা বদল করা যায় না, তেমনি মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্য-পরিচায়ক ভাষার ক্ষেত্রেও শব্দ ও ভাষা বদলের পথ ধরা সমীচীন হয় না। মুসলিম আত্মপরিচিতির সংকট তৈরির ক্ষেত্রে এ-জাতীয় ছোট ছোট শব্দের ভূমিকা কোনো অংশেই কম নয়। বেদনাদায়ক বিষয় হচ্ছে, আমাদের ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যম-টিভি ও রেডিও এ জাতীয় সংকটের ক্ষেত্র তৈরিতে অতি-উৎসাহী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

পাঁচ.

হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক শিশু ও বয়স্কদের নাম বদলে দেওয়ার ঘটনা রয়েছে। রয়েছে ব্যবহৃত শব্দ ও ভাষা বদলে দেওয়ার ঘটনাও। নাম বদলের ক্ষেত্রে কেবল শিরক নয়, অর্থগত অন্য বিষয়েরও ভূমিকা ছিল। সুন্দর-অসুন্দর মর্ম, ক্ষতিকর-কল্যাণকর অর্থ, ডাকার সময় অর্থের হেরফের হওয়ার আশংকা ইত্যাদি কারণেও নবীজি নাম বদলে দিয়েছেন।

মুসলিম শরীফের ২১৩৬, ২১৩৭ ও ২১৩৯ নম্বর হাদীস, তিরমিযী শরীফের ২৮৩৯ নম্বর হাদীস এবং সুনানে আবু দাউদের ৪০২৭ নম্বর হাদীস পাঠ করলে এ বিষয়ে কিছু নিদর্শন, নযীর এবং নির্দেশনা পাওয়া যাবে।

সুতরাং বাংলাভাষাভাষী মুসলমান হিসেবে আমাদের করণীয় অনুধাবন করতে হবে। আমরা একটি সমৃদ্ধ ভাষার অধিকারী—এতে কোনো সন্দেহ নেই। এ ভাষার অধিকার আমাদেরই গৌরব ও কৃতজ্ঞতার একটি নিদর্শন। কিন্তু কোনো ভাষার সব শব্দ ওই ভাষাভাষীর সব পর্যায়ে, সব পরিস্থিতি ও পরিচিতির জন্য প্রয়োগসিদ্ধ ও প্রাসঙ্গিক হয় না। এ কারণেই আরবী ভাষায় অনেক শব্দ বদল করে ব্যবহার করতে সাহাবায়ে কেরামকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বয়ান করেছিলেন। এতে বোঝা যায় উপযোগিতা বিবেচনা করে সঠিক ক্ষেত্রে সঠিক শব্দের প্রয়োগ ও যথোপযুক্ত ভাষারীতির ব্যবহারই কাম্য। এ প্রয়োগই ভাষার গৌরবের জন্য সবচেয়ে সহায়ক ও কল্যাণকর। আমাদেরও উচিত, স্বাতন্ত্র্য ও আত্মপরিচিতি ধরে রাখার জন্য আল্লাহর দেওয়া ভাষার যথোপযুক্ত প্রয়োগ ও ব্যবহার। শব্দে-ভাষায় এ স্বাতন্ত্র্যের উজ্জ্বলতার অনুসন্ধানই হোক আমাদের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের অঙ্গীকার। ■

[*মাসিক আলকাউসার* : ফেব্রুয়ারি ২০১৫]

পয়লা বৈশাখ : এখন যেমন

মিরপুর বার নম্বর বাসস্ট্যান্ড থেকে কালশি সাংবাদিক আবাসিক এলাকায় যাচ্ছি। রিকশায় বসে। ছোট্ট একটা প্রয়োজনে একটা দোকানের সামনে থামলাম। আমার সামনে দুজন লোক দাঁড়িয়ে দোকানদারের সঙ্গে কথা বলছেন। পেছন থেকে এক নজর দেখে একজনকে মনে হলো, শীর্ণকায় হিন্দু বৃদ্ধ। পাঞ্জাবি, ধূতি পরা। কাছে যেতেই দেখি, সে আসলে এক যুবক। শহুরে হিন্দু যুবকরা এখন আর ধূতি পরে না বলেই এ দৃশ্য দেখে কিছুটা অবাক হলাম। আর সঙ্গে সঙ্গেই লক্ষ করলাম, তার গায়ের ধূতিটা আসলে ধূতি নয়, 'ধূতি-পায়জামা'। ধূতির মতোই কুচি, ধূতির মতোই স্ফীত। শুধু ধরে রাখার জন্য মাঝে একটা সেলাই। কথায় ও আচরণে বুঝতে পারলাম, ছেলেটা মুসলিম। ঘটনাটি দু' বছর আগের এক পয়লা বৈশাখ সন্ধ্যার।

দুই.

আর কদিন পরই পয়লা বৈশাখ। সৌরবর্ষ কিংবা বাংলা বর্ষের হিসেবে নববর্ষ। শুরুতে গ্রাম বাংলা ও মফস্বলের হালখাতার এ দিনটি এখন রাজধানীসহ নগরজীবনে বিরাট আয়োজন করে পালিত হয়। চিত্রটি জাঁকালো হয়ে উঠেছে গত দুই-তিন দশকে। পান্তা-ইলিশ, মেলা, চড়ক, বিশেষ রঙের শাড়ি আর বিশেষ ধরনের পাজামা-পাঞ্জাবি পরা মানুষের থৈ থৈ স্রোত নামে রাস্তায়। এক দিনের জন্য বাঙ্গালি সাজার একটা ধুম পড়ে যায়। দেখা যায়, বাঙ্গালি সাজার প্রতিযোগিতায় ছুটতে গিয়ে পোশাক-আশাক থেকে নিয়ে জীবন ও আচারের বহু ক্ষেত্রে ভিন্ন সম্প্রদায় ও প্রতিবেশী ধর্মের সংস্কৃতির কাছে আত্মসমর্পণ করতেও পিছপা হয় না নতুন প্রজন্মের মুসলিম নর-নারী। এ যেন এ প্রজন্মের দেশ ও জাতিপ্রেমের নতুন মহড়া। বাংলা সালের শেষ মাস চৈত্রের শেষ দিনে চৈত্র সংক্রান্তি থেকে

নিয়ে নববর্ষ উদযাপনের ধাপে ধাপে ভিন্ন ধর্মের প্রতীক ও বিশ্বাস জড়িত আচরণে নিজেদের তারা সঁপে দিচ্ছে। বুঝে না বুঝে।

তিন.

পয়লা বৈশাখে আগে গ্রামগঞ্জে ও মফস্বলে 'হালখাতা' অনুষ্ঠান হতো। মুসলিম ব্যবসায়ীরা নতুন হিসাব-নিকাশ শুরু করে দোকানে দুআ করাতেন। হিন্দুরা পূজা-অর্চনা করে মঙ্গলপ্রদীপ জ্বালাত। বছরের প্রথম দিনে ব্যবসা-বাণিজ্য ও কাজ শুরুর একটা আনুষ্ঠানিকতা ঘোষিত হতো, যার যার রীতিতে। কোনো কোনো গ্রামে হাতে বানানো জিনিসপত্র ও তৈজসপাতি বেচাকেনার হাট বসত। কেউ বেচতে যেত, কেউ কিনতে। নগরজীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে তো দূরের কথা, সব গ্রামেও এ দিনটি নিয়ে তেমন কোনো মাতামাতি হতে দেখা যেত না। প্রধানত ব্যবসা ও দোকানদারির হিসাব শুরু-শেষের সঙ্গেই এর আনুষ্ঠানিকতা আবদ্ধ থাকত। কিন্তু গত দুই দশকে হঠাৎ করে বিস্তৃত গণমাধ্যম ও মুসলিম জাতিসত্তার সঙ্গে বৈরিতাবাদী সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো এ দিনটিকে 'বাঙ্গালি সংস্কৃতির ঠিকানা' বানাতে উঠে পড়ে লেগেছে। নগরজীবনে হাঁসফাঁস করা মানুষের একটি অংশ উৎসবের গন্ধ পেয়ে এ দিনটিতে পথে নামতে শুরু করেছে।

পরাণুকরণবাদী সুশীল, সংস্কৃতিকর্মী ও শেকড়ভুলা বাজারবাদী প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যমের সুবাদে এ মিথ্যাটাই প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে যে, বাংলা বছরের পয়লা দিনটিকে উৎসব করে কাটাতে হবে হিন্দুয়ানী তথাকথিত বাঙ্গালি সংস্কৃতির অনুষঙ্গগুলো আপন করে নিয়ে। এটাই বাঙ্গালি জাতির আবহমান কালের সংস্কৃতি। মুসলিম জাতিত্ব ও ইসলামের বৈশিষ্ট্য, বিধিবিধান ও রুচিবোধের কোনো প্রশ্ন এখানে উঠানো যাবে না। এখন 'বাঙ্গালি' নাম দিলেই হলো, কোনো আচরণ ও অনুষ্ঠানে নিজেদের সঁপে দিতে ঢাকা মহানগরীর একটি অংশের মানুষের আর কোনো আপত্তি নেই।

চার.

আরেকটি বিষয় এখানে বড়। সেটি হচ্ছে, অনুষ্ঠান ও উৎসব-প্রবণতা এবং এর সঙ্গে হুজুগ। এই উপাদানটা যেখানে যেখানে পাওয়া যায় সেখানে

এ দেশের গণমাধ্যমের ভূমিকা থাকে বাতাস দেওয়া। এতে ষোলকলা পুরা হয়। গত দুই দশক ধরে এ অবস্থাটাই দেখা যাচ্ছে। শুধু পয়লা বৈশাখের মাতামাতির মধ্যে চোখ আটকে রাখলে বিষয়টা বুঝতে সমস্যা হবে। একটু অন্যদিকেও চোখ ফেরানো যাক।

এ দেশে কি ৩১ ডিসেম্বর রাত বারটার পর কোনো অনুষ্ঠানের রেওয়াজ ছিল বিশ বছর আগে? ছিল না। মিডিয়াও সেটা নিয়ে কোনো ভূমিকা তখন রাখেনি। হঠাৎ মহানগরীর কোনো কোনো অভিজাত এলাকায় থার্টি ফার্স্ট নাইট উদযাপনের খবর প্রচার হলো। মিডিয়া দিল আরো বাতাস। শুরু হলো প্রস্তুতি। বিশ্ব বিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস থেকে নিয়ে সারা দেশে এ রাতটা সরগরম হয়ে উঠল। মনে হতে থাকল এটাই এ জাতির গুরুত্বপূর্ণ সংস্কৃতি। ইদানীং অবশ্য উন্মাদনা বেড়ে যাওয়ায় কিছু নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে থাকে।

চৌদ্দই ফেব্রুয়ারি 'তথাকথিত' ভালোবাসা দিবসের কথা কি এ দেশে কেউ জানত? জানত না এবং কেউ ঘুণাক্ষরেও এ দিনটি নিয়ে কিছু ভাবত না। মিডিয়া বাতাস দিল। তরুণ-তরুণীদের গায়ে আগুন লেগে গেল। দেশব্যাপী এটা এমনভাবে পালিত হতে লাগল, মনে হতেই পারে– এটা এ দেশের আবহমান কালের একটা সংস্কৃতি। এখন খুবই লজ্জা লাগে, এ দিনটা উপলক্ষে যখন অপরাপর বহু জিনিসের সঙ্গে বিশেষ ধরনের কনডমের বিজ্ঞাপনও পত্রিকার পাতায় চোখে পড়ে।

ফুটবল বিশ্বকাপ আর ক্রিকেট বিশ্বকাপের কথাই ধরুন। এমন হুজুগ আর মাতোয়ারা অবস্থা এদেশে ইদানীং তৈরি হয়েছে, মনে হতে থাকে দেশবাসীর সামনে আর কোনো সমস্যাই নেই। ভাবা ও করার মতো কোনো কাজই বাকি নেই। এটাই সবার আচার-অনুষ্ঠান। এটাই সবার ধ্যান-জ্ঞান। তাহলে এসবও কি এ দেশের সংস্কৃতির অঙ্গ?

পাঁচ.

হুজুগ পেয়ে গেলেই যে কোনো আচার-অনুষ্ঠান ও ইস্যুকে জোর করে সার্বজনীনতা দেওয়া বাংলাদেশের প্রভাবশালী মিডিয়ার একটা অভ্যাস হয়ে গেছে। এ কারণে তারা এসব হুজুগে ইস্যুকে দেশপ্রেম ও জাতির প্রতি

বিশ্বস্ততার মাপকাঠি বানিয়ে ছাড়ে। পয়লা বৈশাখের কথাই বলুন, ক্রিকেট বিশ্বকাপের কথাই বলুন, এখানে কেউ স্রোতের উল্টা কিংবা নিস্পৃহ থাকলে তাকে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করা হতে থাকে। ভাবখানা এমন যে, এই স্রোতে ভাসলেই তিনি দেশপ্রেমের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, উল্টোটা হলে তার মাঝে দেশপ্রেম নেই, সে দেশের শত্রু।

সৈয়দ আবুল মকসুদ একজন সেক্যুলার বুদ্ধিজীবী হিসেবে পরিচিত। ২০১৩ সালে দৈনিক সমকাল-এর ১ বৈশাখের ক্রোড়পত্রে ছাপা হওয়া তার লেখার একটা অংশ উদ্ধৃত করছি–

'আমি আমার নিজের শৈশব ও কৈশোরের পহেলা বৈশাখকে যেভাবে দেখেছি, আজকের পহেলা বৈশাখ উদযাপনের সঙ্গে সেই নববর্ষ উৎসবের কোনো মিলই নেই। তখনকার নববর্ষের উৎসবের মধ্যে ছিল অকৃত্রিম প্রাণের আমেজ, তাতে ন্যূনতম কৃত্রিমতা ছিল না, আয়োজনে বিন্দুমাত্র মেকি বা লোক দেখানো বিষয় ছিল না। যা করা হতো, তা হতো স্বতঃস্ফূর্তভাবে, প্রাণের আনন্দে ও অকৃত্রিম জাতীয়তাবাদী আবেগে।

আজ আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? পহেলা বৈশাখের সকালে ঘটা করে রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে খুব বিত্তবান ঘরের মানুষ মাটির শানকিতে পান্তাভাত, খাট্টা ডাল, ইলিশ মাছের ঝোল, মুড়িঘণ্ট, খেজুর গুড়ের ক্ষীর হাপুস-হুপুস করে খাচ্ছে। এই যে রেওয়াজ শুরু হয়েছে, এটি মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণির প্রবর্তিত আয়োজন। এ জাতীয় জিনিস পহেলা বৈশাখে নববর্ষের চিরকালের চেতনা বিরোধী। কারণ এ সমাজের পঞ্চাশ শতাংশ মানুষ খুবই দরিদ্র, তারা ক্ষুধার জ্বালায় পান্তাভাত, পচা ডাল ও অখাদ্য জাতীয় জিনিস যা পায় প্রতিদিন তা-ই খায়। রাস্তায় দাঁড়িয়ে পান্তাভাত আর ইলিশের তরকারি, মুড়িঘণ্ট যারা খায়, তারা বস্তুত এক ধরনের সাংস্কৃতিক অপরাধ করে। এসব আচরণের মাধ্যমে তারা আসলে দেশের অগণিত দরিদ্র মানুষকে পরিহাস করে।'

পয়লা বৈশাখের বর্তমান রেওয়াজ ও মাতামাতি সম্পর্কে এ কথাগুলো কোনো মাওলানা সাহেবের বলা নয়। কথাগুলো যিনি লিখেছেন, তিনি কথিত বাঙ্গালি সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেকে একাত্ম মনে করেন। তারপরও সত্য স্বীকার করে তিনি কথাগুলো লিখতে বাধ্য হয়েছেন।

ছয়.

পয়লা বৈশাখের কথা এলেই অবধারিতভাবে আসে সংস্কৃতির কথা। স্থানীয় সংস্কৃতির সূত্র ধরে জোরটা দেওয়া হয় 'বাঙ্গালি সংস্কৃতির' ওপর। আর বাঙ্গালি সংস্কৃতির উপাদান হিসেবে সামনে আনা হয় হিন্দু ধর্মীয় বিভিন্ন প্রতীক ও আচার-অনুষ্ঠান। একই সঙ্গে উপরের সূত্র ও নীতি অনুসরণ করে পয়লা বৈশাখ উদযাপন করা-না করার প্রস্তুতিকে চিহ্নিত করা হয় জাতীয়তার মিত্রতা ও শত্রুতা হিসেবে। এভাবে হিন্দুয়ানী সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরার জন্য একটা প্রবল ও গভীর মনস্তাত্ত্বিক চাপ সৃষ্টি করা হয় এ দেশের সব স্তরের মুসলিম নাগরিকদের ওপর।

প্রশ্ন হচ্ছে, এক্ষেত্রে আসলে মুসলমানদের করণীয় কী? স্থানীয় সংস্কৃতির নামে অপর ধর্মের বৈশিষ্ট্য ও প্রতীকসহ যে কোনো উৎসব ও অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কোনো সুযোগ কি ইসলামে আছে? ইসলাম যে অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে, সেখানকার ভালোমন্দ সব সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়ার অনুমতি কি তার অনুসারীদের দেয়?

হাদীস শরীফের ভাষ্য, সাহাবায়ে কেরামের আমল এবং ইসলাম বিস্তারের দীর্ঘ হাজার বছরের ইতিহাস থেকে যে সত্যটি ফুটে ওঠে সেটি হচ্ছে, বিশ্বাস, ইবাদত ও জীবনাচারের মৌলিক বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে ইসলাম যে পয়গাম নিয়ে এসেছে সে ব্যাপারে ইসলাম আপসহীন। জীবনাচারের মৌলিক বিষয়ে ইসলাম তার সুনীতি ও শুদ্ধির দীক্ষা দিয়ে কখনো কখনো সেসবের অনুষঙ্গগুলো স্থানীয় সংস্কৃতির ওপর ছেড়ে দেয়। মৌলিক বিষয়ে মিশে যাওয়া ও একাত্ম হওয়ার নীতি ইসলামে থাকতে পারে না। কারণ দূষণ দূর করে শুদ্ধতা আনাই ইসলামের কাজ। এ কারণেই অপর ধর্মের সঙ্গে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত ও অপর ধর্মের পরিচায়ক কোনো বৈশিষ্ট্যকেও আপন করে নেওয়ার অনুমতি ইসলাম মুসলমানদের দেয় না।

পশু জবাই করার ইসলামী নীতি অনুসৃত হওয়ার পর সে পশুর গোশত ভুনা করে, না কি ঝোল করে, না কি কাবাব করে খেতে হবে, এ বিষয়ে ইসলামের কোনো চাপ নেই। স্থানীয় মানুষের রুচি ও সুবিধার ওপর তা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। মাছের তরকারির ধরন কী হবে, তাজা হবে না কি শুটকি হবে, হালাল জিনিস দিয়ে বানানো রুটি বা পিঠার ধরন কী হবে,

মিষ্টি হবে না কি ঝাল হবে, এ ব্যাপারে স্থানীয় সংস্কৃতি অনুসরণে কোনো বাধা নেই। তবে খাদ্য হালাল হওয়া, অপচয় না করা, খাওয়ার আদব ও সুন্নত পদ্ধতি বজায় রাখা নিয়ে ইসলামের নির্দেশনা ও প্রেরণা আছে। একইভাবে পোশাকের ক্ষেত্রেও নারী ও পুরুষের পোশাকের ইসলামী নীতি ও বিধান অনুসৃত হওয়ার পর তা মোটা হলো না পাতলা হলো, তা এ দেশীয় কাপড়ে হলো না ভিনদেশি কাপড়ে হলো, তাতে ইসলামের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। পোশাকের সীমা ও নীতি, আবরণ ও শালীনতা বজায় থাকার পর বাকি বিষয়গুলোতে স্থানীয়দের সুবিধা ও রুচি প্রয়োগের স্বাধীনতা দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এভাবেই মুসলমানের জীবনাচারের সবক্ষেত্রে মৌলিক নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে ইসলামেরই। এক্ষেত্রে স্থান-কাল-ভাষা ও সংস্কৃতির কোনো কুহক দিয়ে ইসলামী নীতি ও চেতনাকে আহত করার অধিকার কোনো মুসলমান রাখেন না। সে হিসেবে পয়লা বৈশাখই হোক, আর অপর কোনো উৎসবই হোক, যদি তাতে ইসলামের নির্দেশনা অনুসৃত হওয়ার পরিবর্তে বিপরীত কোনো বৈশিষ্ট্যকে অনুসরণ করা হয় তবে তাতে যুক্ত হওয়ার ও সমর্থন দেওয়ার সুযোগ মুসলমানের নেই। বাংলাদেশি মুসলমানদের আচার-অনুষ্ঠান হিসেবে সাব্যস্ত করা বা চাপিয়ে দেওয়ার জন্য 'বাঙ্গালি সংস্কৃতি' একক ও প্রধান কোনো তত্ত্ব হতে পারে না। সেটা ইসলামের সঙ্গে সাংঘর্ষিক কিংবা সামঞ্জস্যশীল কি না অবশ্যই দেখতে হবে। কারণ এভাবে কেবল বাঙ্গালি সংস্কৃতির কথা বললে তো বলতে হবে– মন্দিরে গিয়ে পূজা করাও বাঙ্গালি সংস্কৃতি, উলুধ্বনি-কাশর ধ্বনিও বাঙ্গালি সংস্কৃতি, মঙ্গলপ্রদীপ, সিঁথির সিঁদুর, পুণ্যার্থে গঙ্গাস্নান, গোমূত্রে পবিত্রকরণ সবই বাঙ্গালি সংস্কৃতি। ওই অর্থে ধূতি পরা, পৈতা লাগানো, শাঁখা ব্যবহারও বাঙ্গালি সংস্কৃতি। এগুলো কি তাহলে 'বাঙ্গালি সংস্কৃতি' হওয়ার কারণে বাংলাদেশের মুসলমানদেরও অনুসরণ করতে হবে?

মনে রাখা দরকার, কোনো মুসলমান যদি সচেতনভাবে শিরকের প্রতীকযুক্ত কোনো উৎসবে মুগ্ধ হয়ে যোগ দেয় তাহলে তার জন্য সেটা শিরিকে লিপ্ত হওয়ার গুনাহ হবে। আর কোনো কিছু না বুঝে হেলাফেলা করে এ সবে জড়িত হলে অবশ্যই ফিসক-ফুজুরের সে মুরতাকিব হবে।

হুজুগের অথৈ পাঁকে ডুবে না গিয়ে আত্মসচেতন মুসলমান হিসেবে এসব বিষয়ে একটু ভাবার চেষ্টা করা সবার দায়িত্ব।

সাত.

জুমআর নামাযে দাঁড়াব। কাতার ঠিক করছি। এ সময় সামনের কাতারের এক যুবকের পায়জামার কুচির দিকে দৃষ্টি গেল। প্রথমে মনে হলো, মেয়েদের পায়জামা বা সেলোয়ার পরে সে মসজিদে চলে এসেছে। পরেই লক্ষ করলাম, তার পায়জামার পুরোটা জুড়েই কুচি। একটা পয়েন্ট থেকে চারদিকে ভাঁজ ভাঁজ করে কাপড় ছড়িয়ে আছে। হঠাৎ মনে হলো এটা তো দেখা যাচ্ছে, সেই সেলাই করা ধূতি। এরপর ঠিক আমার সামনে দাঁড়িয়ে 'ধূতি' পরে এক মুসলিম যুবক জুমআ আদায় করল। যথারীতি নামাযের পর নিষ্ঠার সঙ্গে সে দুআ করল। সুন্নত পড়ল। তারপর মসজিদ থেকে ধীরে সুস্থে বের হলো। মুসল্লী হিসেবে নিষ্ঠার কোনো কমতি তার নেই। আবার 'ধূতি' পরা নিয়ে তার মাঝে কোনো সংকোচ বা জড়তাও নেই।

ঘটনা এই চৈত্রের। গত দু' বছরে এ রকম 'ধূতি-পায়জামা' আরো দু'-চারবার দেখেছি। তখন ততটা চোখে বিঁধেনি। দেখেছি। রাস্তায়। দূর থেকে। কেমন তরুণ, কতটা সচেতন কিংবা কী পরিমাণ ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলে, জানা ছিল না তখন। রাস্তাঘাটে চোখে পড়া বহু অনভিপ্রেত দৃশ্যের মতো সেটাও ছিল গা-সওয়া। কিন্তু জুমআর নামাযে 'ধূতি-পায়জামা' পরে আসা এই যুবককে দেখে প্রচণ্ড হোঁচট খেলাম।

আট.

এ প্রসঙ্গে দুটি বিষয় আমরা স্মরণ রাখতে পারি এবং দুটি কাজ করতে পারি।

এক. বাংলা বর্ষ হিজরি সন, ঈসায়ী সাল যে কোনো বছরের শুরুতে বা শুরুর দিনে গত বছরের ভুলত্রুটি, গুনাহ-খতার জন্য তাওবা-ইস্তেগফার করতে পারি। সামনের বছরটিতে দ্বীনী ও পার্থিব সব কাজের মঙ্গলের জন্য, সব ক্ষেত্রে খায়র-বারাকাতের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দুআ করতে পারি। ভালো

নিয়ত ও প্রত্যয় গ্রহণ করতে পারি। এ কাজটি আমরা প্রতি মাসে, প্রতি সপ্তাহে, এমনকি প্রতিদিনও করতে পারি। মূলত কেবল বছর বছর নয়, কাজটি দৈনিক ভিত্তিতে করাই আমাদের জন্য কল্যাণকর। সময়ের ভাগটাকে গুরুত্ব না দিয়ে, আনুষ্ঠানিকতা ও উৎসব প্রবণতাকে এড়িয়ে আমরা জীবনের শুদ্ধ ও কল্যাণযাত্রার প্রতিজ্ঞা যে কোনো সময়ই করতে পারি।

দুই. সংস্কৃতির নামে জীবনাচার, অনুষ্ঠান, পর্ব ও উৎসবের যেসব ক্ষেত্রে ঐতিহ্যগতভাবে অথবা পরিকল্পিতভাবে অপর ধর্মের বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি থাকবে, সেসব ক্ষেত্র থেকে মুসলিম হিসেবে নিজেদের সরিয়ে রাখা। অপর ধর্মের অনুসারীদের জন্য তাদের সংস্কৃতির অংশ হিসেবে সেটা তাদের কাছে গ্রহণীয় হতেই পারে, সেখানে বিরোধের কিছু নেই। কিন্তু কিছুতেই সেটাকে বাংলাদেশের সর্বজনগ্রাহ্য বা সার্বজনীন সংস্কৃতি মনে করে তার সঙ্গে মুসলমানরা একত্র হতে পারেন না। এতদঞ্চলের ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য সংবলিত কোনো সংস্কৃতি আঞ্চলিক ও দেশীয় পরিমণ্ডলে সার্বজনীন সংস্কৃতি হিসেবে সাব্যস্ত হতে পারে না। সেটি সবার জন্য অনুসরণীয়ও হতে পারে না। সে সংস্কৃতি সংশ্লিষ্ট ধর্মানুসারীদের সংস্কৃতি হিসেবেই গণ্য হতে পারে। এ জাতীয় সংস্কৃতি সার্বজনীন নয়, বিভাজিত সংস্কৃতিরূপে সাব্যস্ত হতে পারে। কখনো সংখ্যাগুরুদের সংস্কৃতি, কখনো সংখ্যালঘুদের সংস্কৃতি। এ সংস্কৃতি কখনো সার্বজনীন বাংলাদেশি 'সংস্কৃতি' হিসেবে গণ্য হতে পারে না। তবে এর সঙ্গেও থাকতে পারে সহাবস্থান ও সৌহার্দ্য। চাকমা, মগ, গারোদের বহু সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমরা যেমন দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মপন্থা অনুসরণ করে থাকি, ঠিক তেমনি। তাদেরটা তারা করুক, কোনো সমস্যা নেই। সেটা আমাদেরও করতে হবে কেন? জুমআর নামাযে দাঁড়িয়ে সামনের কাতারে 'ধূতি-পায়জামা' পরা মুসল্লী দেখার আগ্রহ তো আমাদের থাকার কথা নয়। ■

[*মাসিক আলকাউসার* : এপ্রিল ২০১১]

প্রসঙ্গ মোহর : উদাসীনতা ও কিছু কথা

এক আত্মীয়ের বিয়ের মজলিসে ছিলাম। বিয়ের প্রধান আনুষ্ঠানিকতাকে প্রচলিত ভাষায় বলা হয় কাবিন। অর্থাৎ কাজী সাহেবের মাধ্যমে বিয়ের চুক্তিপত্র সম্পাদন। সেই কাবিন করার সময় দেখলাম, কনে পক্ষের প্রভাবশালী অভিভাবক জোর দিয়ে বললেন : লেখেন, দেনমোহর ১০ লাখ ১ টাকা। আমি আঁতকে উঠলাম। বর বেচারার মাসিক উপার্জন আমার জানা মতে ১২ থেকে ১৫ হাজার টাকা। উল্লেখ করার মতো কোনো সঞ্চয় তার নেই। পরিবারের শ্রেণি নির্ণয় করলে বলতে হবে সে মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। কিন্তু আমি দেখলাম, বরের পক্ষের মুরব্বীরা ততটা ভড়কে গেলেন না। কেবল মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। যেন ব্যাপারটা একটু বুঝতে চাচ্ছেন। কাজী সাহেবও কলম থামিয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন। বর ও কনে পক্ষের উপস্থিত অভিভাবকদের মাঝে কয়েক মিনিটের হালকা গুমোট অবস্থা ভাঙলেন এবার কনে পক্ষের সেই অভিভাবক। তিনি কিছুটা বিরক্তি ও কিছুটা উল্লাস নিয়ে বললেন, 'এ টাকা কি ছেলেকে আজই পরিশোধ করতে হবে? ছেলে-মেয়ে ঠিক থাকলে ১০ লাখ টাকার হিসাব কেউ নিতে যাবে না।'

মোহর ধার্য করার সামাজিক ও ভুল একটি দর্শনের কথাই তিনি তুলে ধরলেন। তার কথায় সবাই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। যাক এ টাকা তাহলে পরিশোধ করতে হবে না। উভয় পক্ষের সম্মতিতে সেই অঙ্কেই মোহর ধার্য করে বিয়ে সম্পন্ন হলো। এর মানে দাঁড়ালো, মোহর ধার্য করার উদ্দেশ্যের মধ্যেই 'পরিশোধ' নেই। এটা হচ্ছে বরের প্রতি একটা সংকেত। যদি দাম্পত্য-সম্পর্ক কখনো শেষ করতে চাও, তাহলে তোমাকে এই বিশাল অঙ্ক পরিশোধ করেই সেটা করতে হবে। দাম্পত্য রক্ষা বা দাম্পত্য নিরাপত্তার একটা হুমকিমূলক কাগুজে তাবিজ বানিয়ে দেওয়া হলো এখানে মোহরকে। বাস্তবক্ষেত্রে যার কোনোই কার্যকারিতা থাকে না। অপরদিকে মোহরের পাওনা টাকাটা থেকে বঞ্চনার মধ্য দিয়েই দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ

করল মেয়েটি। সে শুরুতেই জেনে গেল, এ টাকাটা পাওয়ার জন্য ধার্য হয়নি। বরং এটা পাওয়ার মতো পরিস্থিতি (অর্থাৎ তালাক) না পড়ার আকাঙ্ক্ষাই তার মাঝে প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে ওঠার কথা।

দুই.

অন্য এক ঘটনার কথা বলি। এক্ষেত্রেও বর-কনে উভয়জন মধ্যবিত্ত পরিবারের। বিয়ের সময় মোহর ধার্য হলো দেড় লাখ টাকা। প্রায় পনের বছর আগের কথা। বাজার ও অলংকার বাবদ পঞ্চাশ হাজার টাকা উসূল বা পরিশোধ দেখানো হলো। কিন্তু বাকি এক লাখ টাকা পরিশোধের চিন্তা বাদ দিয়ে বর তার স্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাইল। নতুন জীবনে প্রবেশকারী লাজুক স্ত্রী দাম্পত্যের প্রথম প্রহরেই তার পাওনা ক্ষমা করে দিল। প্রশ্ন হচ্ছে, এ ক্ষমা কি আন্তরিক ও স্বতঃস্ফূর্ত ছিল? হয়তো ছিল, হয়তো ছিল না।

কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, দুর্ভাগ্যক্রমে এভাবে মোহরের টাকা ক্ষমার পর দাম্পত্য সম্পর্কে কোনো ফাটল দেখা দিলে মোহরের সেই বকেয়া টাকা যথারীতি পাওনা টাকা হিসেবেই দাবি করা হয়। এছাড়া অন্য একটি ব্যাপারও এখানে লক্ষ করার মতো। দাম্পত্যের একদম প্রথম পর্বে অত্যন্ত স্পর্শকাতর সময় ও অনুভূতির মধ্যে স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীর আর্থিক পাওনা ছেড়ে দেওয়ার আবেদন করা কতোটা সঙ্গত? আর্থিক পাওনা দাবি করা বা ছেড়ে দেওয়ার স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর্যায়ে কি মেয়েটি তখন থাকে? স্বামীর ক্ষমা চাওয়ার উত্তরে তার পক্ষে কি বিনয়ের সঙ্গেও 'না' বাচক কোনো উত্তর দেওয়া সম্ভব? এর মানে হলো, মোহরের বকেয়া টাকাটা পরিশোধ না করার জন্য ক্ষমা চাওয়ার একটা কৌশল গ্রহণ করা হলো। এখানেও আর্থিক পাওনা থেকে বঞ্চনার ঘটনা ঘটল মেয়েটির জীবনে। মোহরের পাওনা এখানেও তামাশা হয়ে গেল।

এ রকম ব্যাপার আরেকভাবেও ঘটে। সেটা হচ্ছে, সাধারণ সামর্থ ও সাধ্যের চেয়ে মোহর অনেক বেশি ধার্য করা হয় কেবল সামাজিক মর্যাদা বাড়ানোর জন্য। এখানেও বর-কনে উভয় পক্ষ ধরে রাখেন, এ মোহর পরিশোধের জন্য নয়, কেবল সামাজিকভাবে বড় অঙ্কের মোহর দেওয়া-

নেওয়ার নাম জাহির করার জন্য। এতেও মোহর অনাদায়ী থাকে। যার জন্য মোহর থেকে বঞ্চিত হয় সেই নারী।

তিন.

মোটামুটিভাবে মোহর পরিশোধ না হওয়া বা না করার প্রধান কয়েকটি কারণের একটি হচ্ছে, বিশাল ও সাধারণ দৃষ্টিতে স্বামীর পক্ষে পরিশোধ-সম্ভব নয় এমন অঙ্কের মোহর ধার্য করা, যেন স্বামী কখনো তালাকের পথে যেতে সাহস না পায়। দাম্পত্য রক্ষার একটি প্যাঁচানো উদ্দেশ্যে এবং পরিশোধের চিন্তাও জাগ্রত না হওয়ার নিয়তে এক্ষেত্রে মোহর ধার্য হয়। দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে, মোহরের বড় অংশ বকেয়া রেখে সেটিকে কোনো আর্থিক দায় ও ঋণই মনে না করা। এ জন্য ক্ষমা চাওয়া ও করার একটি রেওয়াজী পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এর তৃতীয় কারণ বলা যায়, মোটা অঙ্কের মোহর ধার্য করে সামাজিকভাবে নাম কুড়ানোর চেষ্টা। পরে এটাকে পরিশোধ করার প্রয়োজন নেই, পর্যায়ের একটা অনন্তকালীন ঋণ মনে করা হয়।

চার.

আর এর সবগুলোই সম্ভব হয় স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মোহর নামক আর্থিক লেনদেনের বিষয়টির প্রকৃতি ও বাস্তবতা সম্পর্কে অজ্ঞতা ও উদাসীনতার কারণে। মোহর তো হচ্ছে বিয়ে বা দাম্পত্যের একটি ওয়াজিব আর্থিক আমল। যা পরিশোধ করবে স্বামী এবং পাবে স্ত্রী। এটি স্ত্রীর আর্থিক পাওনা স্বামীর কাছ থেকে। এ পাওনা সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফে বহু নির্দেশনা এসেছে। মূলত মোহর একজন নারীর নারীত্ব বৈধ উপায়ে একজন পুরুষের কাছে সমর্পণের একটি প্রতীকী সম্মানী এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সাহাবায়ে কেরামের যুগে স্বামী প্রথম মিলনের রাতে স্ত্রীর কাছে যাওয়ার আগেই মোহরের পূর্ণ অঙ্ক বা তার বড় অংশ অথবা একটি অংশ পরিশোধ করা বাস্তব অনুশীলনের ক্ষেত্রে জরুরি মনে করতেন। বকেয়া অংশও অত্যন্ত সম্ভাব্য স্বল্প সময়ের মধ্যে পরিশোধ করে দেওয়া হতো। ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে পুরো মোহর বিয়ে অনুষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিংবা প্রথম মিলনের

রাতের আগে নগদ পরিশোধ করা সবচেয়ে উত্তম। তার পরে উত্তম হলো মিলনের রাতের আগে অন্তত কিছু অংশ পরিশোধ করে দেওয়া এবং সামর্থের দ্রুততম সময়ে বকেয়াটুকু পরিশোধ করা। মোহরের টাকা পরিশোধ না করার পরিকল্পনা যাদের থাকে, তাদের প্রতি হাদীস শরীফে কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে। দাম্পত্যের জন্য মোহর ওয়াজিব, স্বামী দেবে, স্ত্রী গ্রহণ করবে। মোহর বিয়ের সময় তো ধার্য হতেই পারে, ধার্য না হলেও মোহর ওয়াজিব। এমনকি বিয়ের সময় মোহর না দেওয়ার শর্ত করে নিলেও বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর মোহর পরিশোধ করা ওয়াজিব।

পাঁচ.

মোহরের অর্থ থেকে নারীর বঞ্চনা কমানো বা বন্ধ করারও কিছু উপায় অবশ্যই আছে। এর প্রধান উপায় হচ্ছে, বিয়ে ও দাম্পত্যের জন্য মোহরকে অবশ্য আদায়যোগ্য একটি আর্থিক লেনদেনের বিষয় বলে দৃঢ় অন্তঃকরণে মনে করা। এরপর নিজেদের কর্মপন্থা ঠিক করা। মোহর সম্পর্কে কুরআন মজীদ ও হাদীস শরীফের সিদ্ধান্তের প্রতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমর্পিত হওয়া। নারীর সম্মান ও পাওনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। এটিকে কোনোভাবেই পোশাকী কোনো চুক্তি বা রেওয়াজ মনে না করা। এরই কিছু শাখা উপায়ও রয়েছে। যেমন : ভুল ও ঘুর পথে মোহরের ব্যবহার বন্ধ করা। দাম্পত্য রক্ষার জন্য মোহরকে হুমকি হিসেবে ব্যবহার করার চিন্তা বাদ দেওয়া। মোহরের অঙ্ককে সামাজিক মর্যাদার ইস্যু না বানানো। একই সঙ্গে বরের সামর্থ এবং বর ও কনের অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গতিশীল অঙ্কের মধ্যে মোহরের পরিমাণ ধার্য করা। যেন তাতে পরিশোধ করার উদ্দেশ্য থাকে এবং পরিশোধ করা সম্ভব হয়। সর্বোপরি বিয়ের প্রতিটি ক্ষেত্রেই শরীয়ত, সুন্নত ও রুসুমমুক্ততা বজায় রেখে চলা। বিশেষত মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্য কিংবা স্বল্প আয়ের কোনো বরের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, বিয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অহেতুক খরচগুলো না করে মোহরের টাকা পরিশোধের বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া। বরের বিয়ে ও বিয়ে প্রস্তুতির পুরো বাজেট এক লাখ টাকা হলে চেষ্টা করতে হবে প্রাক বিয়ে ও ওলীমার খরচ পঞ্চাশ হাজারের নিচে সেরে ফেলার। বাকি টাকা পূর্ণ মোহর কিংবা আংশিক মোহর হিসেবে পরিশোধ করার। কমিউনিটি সেন্টার বুকিং, বরযাত্রায় চার-পাঁচটা গাড়ি

ভাড়া করা এবং বাহারী বাজারের পথে না হেঁটে বরযাত্রা ও ওলীমার সুন্নতী ধারা অনুসরণ করলে মোহরের টাকা পরিশোধ করা তার জন্য অনেক সহজ হয়ে যাওয়ার কথা।

মোহরকে অবশ্যআদায়যোগ্য আর্থিক আমল মনে করলে সামর্থ সীমিত থাকলেও তা আদায়ের উপায় বের হয়ে আসবে। মোহর আদায়ের উদাসীনতা থেকে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এবং আমাদের সমাজকে রক্ষা করুন। আমীন। ■

[*মাসিক আলকাউসার* : মে ২০১১]